Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.7
Pages	181-193
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

রফিকুল ইসলাম

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ । জ্যোতিভূষণ বাকী ।
কলকাতা : আনন্দবাজার পত্রিকা । ১৯৯৬

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র *আনন্দবাজার পত্রিকা* যখন একের পর এক ব্যবহারবিধি-গ্রন্থমালা প্রকাশ করে, তখন সন্দেহ থাকে না যে এ উদ্যোগ কেবল ঐ পত্রিকার সাংবাদিক বা পাঠকদের জন্যে নয়, বরং বাংলা ভাষার লিখিত রূপের মধ্যে শৃঙ্খলা সন্ধানের জন্যেই করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে কাজটা কি কোনো সংবাদপত্রের, না বাংলা একাডেমী নামে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ও কলকাতার দুটি সরকারী সংস্থার, যার একটির বয়স চল্লিশ অপরটির বিশের অধিক ? সম্ভবত বাংলা ভাষার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এই উদ্যোগ। বাংলা ভাষা এখন আর অবিভক্ত ভারতের বাংলা নামক একটি প্রদেশের *ভারনাকুলার* বা 'আপামর সাধারণের' ভাষা নয়, বরং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা এবং অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের দুটি অঙ্গরাজ্য ছাড়াও একাধিক রাজ্যের অন্যতম প্রধান ভাষা। সর্বোপরি বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক বাঙালিরও ভাষা। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসাম, বিহার, উড়িষ্যার বাংলা ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে বাংলা ভাষায় বহু পত্র-পত্রিকা প্রচলিত। ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অগণিত বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই সব দৈনিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকার অধিকাংশই চলিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে বাংলা ভাষাকে আর কোনোক্রমেই আঞ্চলিক ভাষা বলা যায় না, বাংলা ভাষা আজ যথার্থই একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর কিংবা আসামের কাছাড় থেকে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সুন্দরবন এবং উপকূলীয় দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারী বিশ-পঁচিশ কোটি বাঙালির মুখের ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এতই গভীর ও ব্যাপক যে, এক বা একাধিক ষ্ট্যান্ডার্ড বা মান-ভাষা ছাড়া বোধগম্যতা শূন্য পর্যায়ে নেমে এলেও বিস্ময়ের কিছু থাকে না। এই বিপুল বৈচিত্র্যের অধিকারী বাংলা ভাষার আধুনিক লিখিতরূপের ঐক্য কম বিস্ময়কর নয়।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আরবি ভাষার বহু রূপ প্রচলিত; কিন্তু পবিত্র ধর্মগ্রন্থ *কোরআন শরীফে* বিধৃত লিখিত আরবি ভাষা বিস্তৃত আরব অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐক্যের প্রতীক। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ভাষার লিখিত সাধুরূপের যে অবস্থান ছিল, অর্বাচীন চলিতরীতি আজ কম্পিউটারের দৌলতে সে স্থানটি অধিকার করে নিয়েছে। কাছাড়, করিমগঞ্জ, আগরতলা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, বগুড়া, রাজশাহী, খুলনা, কৃষ্ণনগর, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান বা আসানসোল কিংবা উপমহাদেশের বাইরে লন্ডন বা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ভাষা তুলনা করলে আমাদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হবে; সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক সাধুরীতি নয় বরং মান কথ্য বাংলা (Standard Colloquial Bengali) ভিত্তিক 'চলিতরীতি'ই

একবিংশ শতাব্দির বাংলা লিখিত ভাষার প্রধান রীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। অথচ সাধু রীতি ছাড়া চলিত রীতির বিশ্লেষণ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয় তার কারণ শুধু এই নয় যে, কৃত্রিম সাধুরীতি বাংলা ভাষাভাষী কোনো অঞ্চলের মুখের ভাষা নয়, তার কারণ এটাও নয় যে কলকাতা ও ঢাকা ষ্ট্যান্ডার্ড বা মান নিয়ত আঞ্চলিক বা মুখের ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সজীব থাকছে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তার কারণ এই যে, লিখিত বাংলার সাধুরীতিরই বিবর্তিত রূপ চলিত রীতি। *আনন্দবাজার পত্রিকা* ব্যবহারবিধি গ্রন্থমালার অদ্যাবধি প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ, *বাংলা: কী লিখবেন কেন লিখবেন*, *বাংলা : লেখক ও সম্পাদকের অভিধান* এবং *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* পর্যালোচনা করলে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ* (১৯৩৯) প্রকাশের পাঁচ যুগ পরে প্রকাশিত জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (১৯৯৬)—কোনোটিতেই সাধু বা চলিত রীতি উপেক্ষিত হয়নি; যদিও বিদেশীদের বাংলা শেখাবার জন্যে ইংরেজি ভাষায় যে সব বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে মান বাংলা কথ্যরীতিভিত্তিক চলিত রীতিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে W. Suttou Page রচিত *AN INTRODUCTION TO COLLOQUIAL BENGALI* (১৯৩৪), Edward C. Dimock, Somdev Bhattachari, Suhas Chatterjee রচিত *INTRODUCTION TO BENGALI* (১৯৬৪) এবং Rafiqul Islam রচিত *AN INTRODUCTION TO COLLOQUIAL BENGALI* (১৯৭০/১৯৯০) গ্রন্থগুলির কথা স্মরণীয়। সম্ভবত সময়ে এসে গেছে বাংলা ভাষায় কেবল মান-কথ্য বাংলার বা বাংলা চলিত রীতির একটি ব্যাকরণ রচনার। Jack A. Dabbs রচিত *SPOKEN BENGALI : STANDARD EAST BENGAL* (প্রকৃতপক্ষে DHAKA STANDARD) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ১০০ বাংলা ক্রিয়ার Inflection বা বিকিরণের ১৪০০ রূপের তালিকা দিয়েছেন বিভিন্ন কালের প্রথম পুরুষের রূপের। কোনো বাংলা ব্যাকরণে কি বিভিন্ন পুরুষ, বচন ও কালভেদে সমস্ত প্রধান ক্রিয়ার রূপভেদ খুঁজে পাওয়া যাবে? পবিত্র সরকারের *পকেট বাংলা ব্যাকরণ* (১৯৯৪) কথ্য বাংলা ব্যাকরণের একটি চমৎকার মডেল; কিন্তু তিনি পকেট ব্যাকরণ রচনা না করে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করলেন না কেন?

আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধির তৃতীয় উদ্যোগ *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* বাংলা লিখিত ভাষার সাধু ও চলিত রীতির অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ। এখানে অনুশাসন অর্থ এই নয়, যেসব অনুশাসন মেনে বাংলা ভাষা লিখিত তার সংকলন; বরং গত দুই শতাধিক বৎসরে লিখিত বাংলার বিবর্তন থেকে সংগৃহীত এবং পূর্বতন বৈয়াকরণদের রচনা অবলম্বনে সংগৃহীত সুপ্রতিষ্ঠিত অনুশাসনগুলিকে পরিচ্ছন্ন এবং সুসংগঠিত

রূপে ত্রিশটি অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস। এই ব্যাকরণ রচনায় রচয়িতার রূপরেখা মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ; কিন্তু তিনি বার বার তার পূর্বসূরী বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা এবং বহুবার আরবি, ফার্সি ও ইংরেজি ব্যাকরণের বিভিন্ন ধারণা ও পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে তার পদ্ধতি প্রথাগত এবং তিনি কখনও প্রচলিত ঐতিহ্য লঙ্ঘন করেননি, যদিও তার সুযোগ ছিল। যেহেতু তার ব্যাকরণটি পাঠ্যক্রম মেনে রচিত নয়, সেহেতু তিনি বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে রামমোহন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা রবীন্দ্রনাথের মতামত মেনে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, তার কারণ সম্ভবত ঐ মহাপুরুষগণ বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আঁচল থেকে বের করে খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ করার জন্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকলেও তারা কেউই একটিও পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেননি। জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*-এর পাঁচযুগ পরে রচিত বা প্রকাশিত হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোতে রচিত বাংলা ব্যাকরণের সুপ্রতিষ্ঠিত ধারা থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা নেই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণের ধারণায় তার সময় থেকে অনেক অগ্রসরমান ছিলেন, কিন্তু তিনিও *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে* সংস্কৃত ব্যাকরণের আদল অস্বীকার করেননি। তেমনি জ্যোতিভূষণ চাকীও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*-এর রূপরেখার বাইরে গিয়ে নতুন কোনো ছকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা করেননি; যদিও তার গ্রন্থের শেষে প্রাচীন ভারত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যাকরণের সাযুজ্য খোঁজার প্রয়াস লক্ষণীয় (৩৫ থেকে ৩৯ অধ্যায়ে) এবং পাশ্চাত্য রীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত।

ভাষা, বাংলা ভাষা, উপভাষা, মান্য চালিত ভাষা এবং সাধুভাষায় সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়ে আলোচ্য *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* শুরু। ভাষার সংজ্ঞায় একটা কথা বলা প্রয়োজন ছিল, ভাষা সামাজিক যোগাযোগের বাহন বা মাধ্যম। বাংলা ভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি প্রমথ চৌধুরীর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যার শেষে বলা হয়েছে, 'বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালির মুখে।' বাংলা বাঙালির মুখের বা মাতৃভাষা। বাংলাদেশের মুনীর চৌধুরী সে মাতৃভাষার সংজ্ঞা দিয়েছেন:

> আমার মাতৃভাষা কি? বাংলা ভাষা। সমগ্র বাংলা ভাষা। বিচিত্ররূপিনী বাংলা ভাষা। অভিধানে আছে ষোড়শ রমণী মাতৃসম্বোধনীযোগ্যা। শ্বশ্রু থেকে তনয়া, গর্ভধারিনী পিতৃরমণী ষোল নয়, আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ। তারা সব পদ্মিনীর সহচরী। আমার মাতৃভাষা তিব্বতের সহচরী। আমার মাতৃভাষা মনসার দর্পচূর্ণকারী, আরাকান রাজসভার মনিময় অলংকার, বরেন্দ্রভূমির বাউলের উদাস আহ্বান। মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম আমার মাতৃভাষা। আমার মাতৃযাষা বাংলা ভাষা।

বলাবাহুল্য মুনীর চৌধুরী 'মাতৃভাষা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা ভাষার বিচিত্ররূপের আলংকারিক বর্ণনা—মুখের ভাষার রূপ বিচিত্র, মুখের ভাষা যখন লেখার ভাষা হয়ে ওঠে তখনও তার বিচিত্র রূপ যা ধরা পড়ে সাহিত্যে। তাই ভাষার ইতিহাস খুঁজতে বিভিন্ন কালের সাহিত্য খুঁজতে হয়। উপভাষা, মান্যচলিত ভাষা, সাধুভাষা, চলিতভাষা সব মিলিয়েই ভাষা, বাংলা ভাষা কোনো ব্যতিক্রম নয়; তাই *বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* যখন বলা হয়, 'বাঙালির মুখে এক-এক অঞ্চলে এক-এক ভাষা। এই আঞ্চলিক ভাষাকে আমরা উপভাষা বলি' তখন তাকে যথার্থই বলতে হয়। কিন্তু যখন 'মান্যচলিত ভাষা' নিয়ে লেখা হয়: 'ভাগীরথী তীরে শিক্ষিত সমাজের উপভাষা লেখ্য ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। একে আমরা বলছি মান্য চলিত ভাষা (Standard Colloquial Bengali)—তখন খটকা না লেগে পারে না; কারণ লেখ্য ভাষা Standard Colloquial হয়েছে না Standard Colloquial-এর লেখ্য রূপ চলিত রীতির ভিত্তি হয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সাধুভাষাকে *বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* যখন বলা হয় 'Chaste and Elegant Bengali' তখনও প্রশ্ন ওঠে, কারণ এই সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে, 'এ ভাষা একান্তভাবেই লেখার ভাষা, মুখের ভাষা নয়।' যা মুখের ভাষা নয়, কৃত্রিম লেখার ভাষা তা Chaste and Elegant হয় কিভাবে ?

এক ভাষার এক বা একাধিক Standard বা Elegant রূপ থাকতে পারে, ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন দেশে অন্তত ছয়টি Standard রূপ রয়েছে, ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাষারও এখন অন্তত দুটি Standard বা Chaste রূপে গড়ে উঠেছে—'Calcutta Standard' এবং 'Dhaka Standard'। বলাবাহুল্য, Standard Colloquial বা মান কথ্যভাষাও উপভাষা, তবে সামাজিক বা Social dialect; বাংলা আঞ্চলিক ভাষা 'ভৌগলিক উপভাষা' আর মান ভাষা 'সামাজিক উপভাষা'। বাংলা লেখার ভাষারও দুটি রূপ বা রীতি সাধু এবং চলিত। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* বাংলা মুখের ভাষার ব্যাকরণ নয়, লেখার ভাষার দুটি রীতির ব্যাকরণ এবং অনুশাসনমূলক বা Prescriptive, বর্ণনামূলক বা Descriptive ব্যাকরণ রচিত হয় মুখের ভাষা নিয়ে। বাংলা সাধুভাষা সংস্কৃত ভাষার আদর্শভিত্তিক, বাংলা চলিত ভাষা সাধুভাষারই বিবর্তিত রূপ; তবে তা ক্রমবর্ধমানরূপে মুখের ভাষা বিশেষত Standard Colloquial ভিত্তিক এবং আঞ্চলিক ভাষা থেকে নিত্য উপাদান গ্রহণের কারণে জীবন্ত। বাংলা সাধু ভাষা শুধু কৃত্রিম নয়, দু'শ বছরের মধ্যেই মৃতপ্রায় ভাষায় পরিণত। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল পর্তুগিজ ভাষায়, পর্তুগিজ পাদ্রি মনোয়েল দা আসসুম্পসাঁও ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে যা রচনা করেছিলেন পূর্ব বাংলার ভাওয়াল পরগণার নাগরী গ্রামে বসে। তার ব্যাকরণ মুখের ভাষা ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল আর সে জন্যে কোনো বাংলা উপভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঐ ব্যাকরণে খুঁজে পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন *গৌড়ীয়*

ব্যাকরণ, বাংলা ব্যাকরণ নয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *বাংলা ব্যাকরণ* রচনা করেছিলেন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আর ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ* ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে। শেষোক্ত দু'জন পণ্ডিতেরই পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি ছিল; কিন্তু তারা উভয়েই বাংলা ব্যাকরণ রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের মডেল অনুসরণ করেন—যেমন ল্যাটিন ব্যাকরণের অনুসরণে ইংরেজি ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হলেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ*-এর ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; যদিও কোনো পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এ ব্যাকরণ রচিত নয়।

বাংলার শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন উপাদান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে জ্যোতিভূষণ প্রচলিত তৎসম, সংস্কৃতায়িত শব্দ, প্রতিশব্দ, তদ্ভব শব্দ, অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ, বিদেশি শব্দ, দেশি শব্দ, প্রাদেশিক শব্দ, মিশ্র শব্দ, অনুবাদ শব্দ, অপশব্দ বা লঘুশব্দ পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করেছেন। লক্ষণীয় যে 'তৎসম' থেকে বাংলা শব্দের বর্গীকরণের রীতির সূচনা আলোচিত ব্যাকরণেও অনুসৃত। ঐ প্রক্রিয়ার একটি ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় পবিত্র সরকারের *পকেট বাংলা ব্যাকরণ* গ্রন্থে, বাংলা শব্দভাণ্ডারকে ধার করা শব্দ (কৃতঋণ), বহন করা শব্দ (তদ্ভব) সংকর শব্দ (অজ্ঞাতমূল) এই প্রধান তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে ধার করা শব্দে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি; ইংরেজি, পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপিয়, অন্যান্য(চীনা, রুশ, জাপানি), হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা; বহন করা শব্দ—সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত হয়ে বিবর্তিত বা তদ্ভব শব্দ। উৎস অজ্ঞাত তবে প্রাচীন দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক বা অনার্য উৎস থেকে আগত অজ্ঞাতমূল শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র সরকারের শ্রেণিবিন্যাসে 'তৎসম' শব্দকে বাংলা শব্দাবলির মৌলিক উপাদান বা কেন্দ্রবিন্দু ধরার রীতি থেকে সরে যাওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়। বস্তুত বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন উপাদানকে ব্যুৎপত্তি বা উৎসগত দিক থেকে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, আরবি, ফারসি, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, বাংলা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা যায় কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। অন্যথা তৎসমকে যেমন আবার অর্ধতৎসম রূপে বিন্যস্ত করতে হয় তেমনি তদ্ভবকে অর্ধতৎভব, বিদেশীকে অর্ধ বিদেশী, অনার্যকে অর্ধ অনার্য, দেশীকে অর্ধ দেশী শব্দরূপে বিন্যস্ত করতে হয়। কারণ যে ভাষা থেকেই শব্দ আসুক না কেন বাংলা ভাষায় তাকে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। মূল উচ্চারণ অবিকৃত থাকার বা রাখার কৌলিণ্য কোনো উৎস থেকে আগত শব্দই কি দাবি করতে পারে?

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা সম্পর্কে আলোচনার শেষে আলোচ্য ব্যাকরণে প্রশ্ন তোলা হয়েছে : এখন অনেকেই বলছেন সাধু ভাষা কৃত্রিম ভাষা, আজকের জগতে তা অচল। পশ্চিমবঙ্গের একদা ব্যবহৃত ভাষাকে কৃত্রিম বলা উচিত হবে কি না তা বিচার্য। সাধুভাষা কি একদা কেবল পশ্চিম বঙ্গে ব্যবহৃত হত? আমাদেরতো ধারণা

সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই একদা কেবল দলিল-দস্তাবেজ বা চিঠিপত্র নয়, সাহিত্যের বা লেখার ভাষা ছিল সাধুভাষা। আজ কেবল পশ্চিম বঙ্গেই নয়, সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই চলিত ভাষা সাধু ভাষার স্থান গ্রহণ করেছে। চলিত ভাষাওতো কৃত্রিম, মান্য কথ্য ভাষাও কি অকৃত্রিম? কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা নামে হেয় প্রতিপন্ন তথাকথিত 'অশুদ্ধ' ভাষাই কৃত্রিম ভাষা নয়; তবুও যোগাযোগের বাহন বা মাধ্যমরূপে এক একটি ভাষা সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বা একাধিক মান বা মান্য কথ্য ভাষা কিংবা সামাজিক উপভাষা গড়ে ওঠে, যে ভাষা সাধু ভাষার চেয়ে কম কৃত্রিম নয়। সাধু ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে জ্যোতিভূষণ চাকী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

> এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি (বিশেষতঃ ক্রিয়াপদে) প্রাচীন বাঙ্গলার তিন চারিশত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার রূপ; আবার এই ভাষা মুখ্যত পশ্চিম বঙ্গের প্রাচীন মৌখিক ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ববঙ্গের বহুরূপ এবং বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে।

সাধু ভাষার ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করছেন না। কেউ এমন কথাও বলছেন না যে, সাধু ভাষায় লেখা গদ্যসাহিত্য উনিশ শতকের সূচনা থেকে শুরু করে বিশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম পাদ পর্যন্ত অজস্র সোনার ফসল ফলায়নি? কেউ কি অস্বীকার করেছেন, চলিত ভাষা প্রচলিত হবার পরও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধু ভাষাতেও লিখেছেন। কেউ তর্ক করবেন না যে, সাধু ভাষায় লিখিত ঐতিহ্যবাহী বিপুল সাহিত্যের পঠন-পাঠনের এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কেউ কাউকে বলে দিতে পারেন না, সাধু ভাষাতেও লিখতে হবে এবং তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে, তাহলে তা হবে জবরদস্তি। ভাষা আর যাই সহ্য করুক জোর-জবরদস্তি সহ্য করে না।

বিশ্বের সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীরাও *ইলেকট্রনিক মিডিয়ার* যুগে প্রবেশ করেছে। এখন আর শুধু লেখা বা পাঠের যুগ নয় এখন দর্শন ও শ্রবণের যুগ। পত্রিকা মাধ্যমে সাধু ভাষা প্রকাশ করলেও *ইলেকট্রনিক* মাধ্যমে কি করা যাবে? টেলিভিশনে মান কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু সাধু ভাষা? পত্রপত্রিকা ও বইপুস্তকের পাঠকের চেয়ে যে এখন টেলিভিশন দর্শকের সংখ্যা অনেক অনেক গুণ বেশি তার কারণ টেলিভিশন দেখার জন্যে অক্ষরজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পাঠ করার জন্যে এ-প্রয়োজন অপরিহার্য। *ইলেকট্রনিক* প্রচার মাধ্যমের অভাবিত প্রভাবের জন্যেই মান্য কথ্য বাংলার বিকাশ অনিবার্য আর যেহেতু বাংলা চলিত রীতি মান্য

কথ্য বাংলার নিকটবর্তী সে কারণে সাধুভাষার ঐতিহাসিক মূল্য, ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যই অক্ষয় হয়ে থাকবে, তবে ব্যাপক যোগাযোগের বাহনরূপে নয়। বাংলাদেশে অবশ্য সাধু না চলিত ব্যবহার করা হবে সেটা মূল সমস্যা নয়; বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা অত্যন্ত শক্তিশালি ও জীবন্ত, বস্তুত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা সে অঞ্চলের বাঙালির মাতৃভাষা। মান্য কথ্য বাংলা (Standard Colloquial Bengali) প্রকৃতপ্রস্তাবে তার জন্যে দ্বিতীয় ভাষা (Second Language)। বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব অত্যন্ত গভীর, সে মান বাংলা বা ইংরেজি বা আরবি যে ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করুন না কেন, সে ভাষার ওপর তার আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব থেকেই যায় অর্থাৎ তার মাতৃভাষা আঞ্চলিক উপভাষার ধ্বনিতত্ত্বে ও স্বরভঙ্গি অন্তর্নিহিত ভিত্তিরূপে তার কথ্য বাংলা-ইংরেজি ব্যবহারে সক্রিয় থাকছে।

বাংলাদেশে আরও একটি ব্যাপার ঘটে গেছে, মান কথ্য বাংলা (Standard Colloquial)-র পাশাপাশি বিভিন্ন উপভাষার মিশ্রণে একটি উপ মান ভাষা বা Sub Standard ভাষা গড়ে উঠেছে, যাকে আমরা 'Standard Eastearn Bengali' বলতে পারি। বলাবাহুল্য যে, বাংলাদেশের মুখের ভাষার মতো লেখ্য ভাষাতেও ঐ সব প্রভাবই কার্যকর; সুতরাং যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষা সে বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি অনুমান করা যেতে পারে। কাজেকাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির আবাসভূমি বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে অতীত অপেক্ষা তার বর্তমান রূপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাই আমাদের জন্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত না হয়ে পারে না। আমাদের তো মনে হয় এমন একটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রয়োজন যে ব্যাকরণে মুখের ভাষার মান্য (Standard) রূপের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষা বা উপভাষার সম্পর্ক, সাধু ও চলিত রীতির লিখিত ভাষার দুটি রূপের তুলনা এবং মান বা উপভাষা নির্বিশেষে মুখের ভাষা আর সাধু-চলিত আঞ্চলিক নির্বিশেষে লেখার বা সাহিত্যের ভাষার সম্পর্ক প্রদর্শিত হবে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, মুখে মুখে রচিত বাংলার বিশাল লোকসাহিত্য আঞ্চলিক ভাষাতেই রচিত যার সংগৃহীত এবং লিপিবদ্ধ রূপ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রসঙ্গক্রমে গোপাল হালদারের *A Comparative Grammar of East Bengali Dialects* (১৯৮৬) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এখন প্রয়োজন একটি 'Comparative Grammar of Bengali Dialects' যে গ্রন্থের ফলে সম্ভবপর হবে সাধু ও চলিত রীতির ভাষার ওপর বিভিন্ন উপভাষার প্রভাব নির্ণয়।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। লিখিত ভাষার ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা কিভাবে করা যায়? মুখের ভাষার ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্ব সাংগঠনিক (Structural) পদ্ধতিতে Articulatary Phonetics বা

ধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও রীতির বিচার কিংবা Phonemics বা মূলধ্বনি বিচারের প্রক্রিয়ায় করা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ আবদুল হাই কথ্য বাংলার *ফোনেটিক্স* আর চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী কথ্য বাংলার *ফোনেমিকস্* চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। Generative Phonology পদ্ধতিতেও কথ্য বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology বিশ্লেষণ সম্ভবপর এবং পবিত্র সরকার তা করেছেন। মুখের ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে লিখিত ভাষার বর্ণমালার বিশ্লেষণ Graphenics পদ্ধতিতে করা সম্ভবপর, রফিকুল ইসলাম এবং সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা Graphemics নিয়ে বিশ্লেষণে রয়েছে। জ্যোতিভূষণ চাকী *বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* বাংলা লেখ্য ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন, ধ্বনি-বর্ণ-উচ্চারণ, ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা, গতি (ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি), সন্ধি, ঝোঁক-অর্ন্তযতি-সুর এবং ছেদচিহ্ন বিষয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে।

লক্ষণীয় যে, আলোচ্য ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার শুরুতে রয়েছে 'ধ্বনি-বর্ণ-উচ্চারণ'। ফলে প্রথমে ফোনেটিক পদ্ধতিতে বাংলা স্বর, ব্যঞ্জন, অধিস্বর, যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহ কিংবা Phonemic পদ্ধতিতে বাংলা ধ্বনিমূলসমূহ নির্দেশ করে বাংলা কোন ধ্বনির জন্যে কোন প্রতীক বা বর্ণ বা লিপি ব্যবহৃত হয় তা নির্দেশ করা যেত। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি সম্ভবত এই কারণে যে, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* বাংলা মুখের ভাষার নয়, বরং লিখিত ভাষার সাধু ও চলিত রীতির বর্ণমালার পরিচয় দিতে চাওয়া হয়েছে। সে জন্যে এ ব্যাকরণে ধ্বনিপ্রতীক বর্ণ-স্বর ও ব্যঞ্জন-স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে। স্বরধ্বনির ও ব্যঞ্জনধ্বনির গতানুগতিক সংজ্ঞা দিয়ে স্বরধ্বনির প্রতীককে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতীককে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়েছে। বাংলা ৭টি মূল স্বরধ্বনির তালিকা এবং ১৪টি স্বরবর্ণমালার তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যঞ্জনান্ত স্বরধ্বনির অর্থাৎ া-ি-ী-ে,ৈ—কার প্রভৃতি প্রতীক সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে 'অ'-এর যে কোনো ব্যঞ্জনান্ত প্রতীক নেই এবং তা যে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতীকেই অন্তর্নিহিত, ফলে বাংলা বর্ণমালা যে Phonetic না হয়ে Syllabie হয়ে গেছে সে কথা উহ্য রয়ে গেছে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিশ্লেষণে বিভিন্ন স্বরের উচ্চারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে 'অ > ও' কে বলা হয়েছে বিকৃত উচ্চারণ, আসলে নিম্নস্বর অ এর পরে উচ্চস্বর ই বা উ থাকলে অ হয়ে পড়ে উচ্চমধ্য ও; এটা স্বরসঙ্গতির কারণে পরিবর্তন, বিকৃতি নয়। একইভাবে বাংলা মূল স্বরধ্বনি তালিকায় 'অ্যা' (এ্যা) ধ্বনিটিকে প্রদর্শন করা হলেও ধ্বনিটির উচ্চারণকে বিকৃত উচ্চারণরূপে নির্দেশ করে ঐ উচ্চারণ সম্বলিত শব্দের একটি বর্ণনাক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও বিকৃত উচ্চারণ কথাটি অবান্তর। বাংলা বর্ণমালা উদ্ভবের সময় 'এ' ধ্বনি ছিল, 'এ্যা' ধ্বনি ছিল না; পরবর্তীকালে এ ধ্বনির Phonetic split বা ধ্বনি-বিভাজনের মাধ্যমে অ্যা বা এ্যা ধ্বনির উদ্ভব ঘটে

বিশেষ পারবেশে তখন নতুন প্রতীকের পরিবর্তে 'এ্যা' ধ্বনির জন্যে এ, ে, ্ প্রতীকই ব্যবহৃত হতে থাকে। একটি লিখন প্রণালীতে একাধিক ধ্বনির জন্যে একটি প্রতীকের ব্যবহার অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, ইংরেজিসহ অনেক লিখন প্রণালীতেই এই প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। বিভিন্ন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করে আলোচ্য ব্যাকরণে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং পরে জিভের অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক স্বরের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। যৌগিক বা দ্বিস্বরের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অর্ধস্বরের আলোচনা নেই, বাংলা ব্যঞ্জন মূলধ্বনিগুলির শ্রেণিবিন্যাস নেই। ফলে বাংলা ধ্বনি ও বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিচয় স্বচ্ছ নয়। বাংলা স্বরধ্বনির যে মৌখিক ও অনুনাসিক উভয় প্রকার উচ্চারণ সম্ভব তার উল্লেখ নেই; যদিও চন্দ্রবিন্দুর কথা বলা হয়েছে। এই সমস্যার মোকাবেলা করা যেত যদি প্রথমেই বাংলা মূল স্বরধ্বনি, অর্ধস্বরধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের তালিকা ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করে কোন ধ্বনির জন্যে কোন প্রতীক বা বর্ণ বা লিপি ব্যবহৃত হয় তা নির্দেশ করা হতো। বাংলা অক্ষর সংগঠন (Syllable Structure) এবং স্বরভঙ্গি (Intonation Pattern) সম্পর্কেও ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা এবং তা প্রকাশে বাংলা বর্ণমালায় ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা আরও স্পষ্ট ভাবে দেখানো যেত। বাংলা মূল স্বরধ্বনিগুলি জিহ্বার অবস্থান, উচ্চতা ও ওষ্ঠের আকৃতি আর ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণস্থান ও রীতি অনুযায়ী প্রদর্শন করে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রদর্শনী এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা হলে বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারত।

আলোচ্য ব্যাকরণে শব্দ সংগঠন বা রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রথাগত পদ্ধতিতে করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের (মৌলিক, সাধিত, অব্যয়, যৌগিক, যোগরূঢ়, রূঢ়) পরিচয় দিয়ে প্রত্যয় (কৃৎ ও তদ্ধিত), উপসর্গ, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত রীতির অনুসরণে আলোচনা রয়েছে। পদ সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া, বাচ্য, ধাতুর গণবিভাগ, কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ, বিভক্তি ও শব্দরূপ, সমাস, শব্দ নিয়েই প্রথাগত প্রক্রিয়ায় আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যাকরণের আদলে Declention of Noun এবং Verb Inflection এই দুই শ্রেণির বাংলা পদের ব্যবহারবিধি প্রদর্শন অপ্রাসঙ্গিক হত না। বাংলা ক্রিয়ারূপগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদর্শন এবং সাধু ও চলিতরীতিতে তার ব্যাকরণ নির্দেশ খুবই প্রাসঙ্গিক হত সন্দেহ নেই। আমরা যে বলেছি, রূপতত্ত্বের আলোচনায় প্রথাগত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে তার উদাহরণস্বরূপ কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ বিষয়ক আলোচনার উল্লেখই যথেষ্ট। বাংলা ব্যাকরণে 'কারক বিতর্ক' একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক, বেশ কয়েকজন মহারথী বিভিন্ন সময়ে এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* জ্যোতিভূষণ চাকী ঐ বিতর্কের বিভিন্ন মতামত

উদ্ধৃত করেছেন; কিন্তু কমক্ষেত্রেই তাদের মতামত গ্রহণ করেছেন। তিনি সযত্নে সংস্কৃত কারকের রূপরেখার মধ্যেই অবস্থান নিরাপদ ভেবেছেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণে জ্যোতিভূষণ চাকী উল্লেখ করেছেন কর্তা, কর্ম, করণ ও অধিকরণ ছাড়া সংস্কৃতে আরও দুটি কারক স্বীকৃত: এরা সম্প্রদান ও অপাদান কারক। রামমোহন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কেউ সম্প্রদান স্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথও বাংলায় সম্প্রদান কারক রাখার বিরোধী ছিলেন। অপাদানের জন্যে শব্দের পৃথক রূপের অনস্তিত্বের যুক্তিতে রামমোহন অপাদানও স্বীকার করেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও অনুসর্গ যোগে কারকত্ব স্বীকার করেননি। বাংলায় কারক কয়টি তা নির্ধারণে সংস্কৃত কারকের সংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার রীতির বিরোধিতায় রামমোহন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাট্য যুক্তিতর্ক সত্বেও শেষ পর্যন্ত জ্যোতিভূষণ চাকীর সিদ্ধান্ত—বস্তুত কারকের সংখ্যা নিয়ে মতান্তর থাকলেও বাংলায় এখনও সংস্কৃতের নিয়ম অনুযায়ী ছয়টি কারক (কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ) মানা হচ্ছে এদের ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে। ক্রিয়ার সঙ্গে যার যোগ নেই এমন পদকে কারক বলা হয়নি সংস্কৃত ব্যাকরণে। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ তাই কারক নয়। ইংরেজি ব্যাকরণের মতে সম্বন্ধও Case, সম্বোধনও Case; কারণ ইংরেজি ব্যাকরণের মতে বাক্যে যে কোনো পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ককেই Case বলা হয়। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণে* রামমোহন রায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ইংরেজি ব্যাকরণের উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত কারকের নিয়মে (ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ) বাংলা কারকের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। পাঠ্যক্রম অনুসরণে *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* রচিত হয়নি; ফলে সুযোগ ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপরেখার বাইরে বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার। কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ* আর জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* সে কারণেই অবস্থানগত দিক থেকে একই স্থানে রয়ে গেছে; যদিও রচনাকালের দিক থেকে দুটি ব্যাকরণের ব্যবধান পাঁচ যুগের অধিক।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে বাক্য সম্পর্কিত আলোচনাতেও প্রথাগত রীতি অনুসৃত—সরলবাক্য, জটিলবাক্য, যৌগিক বাক্য দিয়েই বাক্যের গঠনগত বিভাগ করা হয়েছে। তবে বাংলা বাক্য-বিন্যাস সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা গুরুত্বপূর্ণ; সংস্কৃত বাক্য-বিন্যাসে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই উপস্থাপনাই বাংলা সাধুভাষার স্বীকৃতক্রম, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে (না দ্বিতীয় দশক থেকে?) সাহিত্যে চলিত ভাষার শুরু হবার পর গঠনরীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। সাধু ভাষার নির্দিষ্ট পথে সে ভাষা তেমন চলল না। উদ্দেশ্যের পর বিধেয় ও ক্রমও গেল বদলে; কর্মের

পর ক্রিয়া, তারপর কর্তা, এ ধরনের বিন্যাস সহজসঙ্গত হয়ে উঠল। চলিত বাংলার দ্বিমাত্রিকতা অথবা স্বরধ্বনিলোপ, ক্রিয়াধ্বনি-সংক্ষেপণ ইত্যাদি বিন্যাসভঙ্গিতে বৈপরীত্য আনল খুব স্বাভাবিকভাবেই। সাধু ভাষার cuphony আর চলিত ভাষার euphony এক রইল না। উদ্দেশ্য বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন ঘটলেও সাধু চলিত দুই ভাষাই একটি নিয়ম মেনে চলে, বিবর্ধক বা বিশেষণ স্থানীয় পদগুলি উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের ও কারকপদগুলির আগে বসে। চলিত বাংলার শব্দবিন্যাসে কিছুটা স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ক্রিয়ার জোড় ভাঙ্গা চলে না।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তৃতীয় ভাগে 'নব্য ব্যাকরণ চিন্তা'র পরিচয় প্রদানে চমস্কির রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণ এবং সোস্যুর-চমস্কি ও প্রাচীন ভারতীয় বাকচিন্তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে; কিন্তু ব্লুমফিল্ডের সাংগঠনিক ব্যাকরণের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় নেই। তৃতীয় ভাগে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ও নূতন ব্যাকরণ ভাবনা। যেখানে তিনি সাংগঠনিক ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের উপযোগিতা স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন, ধ্বনিতত্ত্বে 'বর্ণ' ও 'শব্দ' বিচারের সঙ্গে আধুনিক ব্যাকরণের ধ্বনিমূল বা স্বনিম (Phoneme) এবং রূপমূল বা রূপিম (morpheme)-এর ধারণাও হয়তো আনা যেতে পারে, স্বনিম যেমন একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনি একক, 'বর্ণ' বলতে ঠিক তা বোঝায় কিনা একথা ভেবে দেখা দরকার। রূপমূল বা রূপিমের সঙ্গে শব্দের পার্থক্যও এ প্রসঙ্গে এসে পড়বে। ধ্বনিমূলের মুক্তরূপ আর বদ্ধরূপের কথাও তারই সঙ্গে আলোচ্য। এদিক দিয়ে উপসর্গ বা প্রত্যয়কে আমরা বদ্ধরূপমূল হিসেবেও দেখতে পারি। একই বদ্ধরূপমূল মুক্তরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত করে বহু শব্দই আমরা গড়ে তুলতে পারি। সমাসের ক্ষেত্রে একাধিক রূপমূল যুক্ত করে আমরা যৌগরূপমূল সৃষ্টি করতে পারি অজস্র। ভাষার এই অজস্র শব্দগঠনের শক্তিকেও আমরা সংজননী শক্তি (Generation) আখ্যা দিতে পারি কিনা তাও চিন্তনীয়। জ্যোতিভূষণ চাকীর এইসব প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বা মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাংগঠনিক পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology), রূপতত্ত্ব (morphology) এবং লিপিতত্ত্ব (Graphemics)-এ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং মান কথ্য বাংলার (Standard Colloquial Bengali) স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপরেখার বাইরে কার্যকরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে জ্যোতিভূষণ চাকী পাশ্চাত্য ব্যাকরণ চিন্তার প্রয়োগ যে করা সম্ভব তা স্বীকার করেছেন। 'প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ও নূতন ব্যাকরণ ভাবনা' অধ্যায়ে বাংলা ব্যাকরণের নবায়নের সূত্রান্বেষণ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন যে, আমরা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নামে বাংলা ব্যাকরণের যে রূপরেখা রচনা করেছি,

তাতে আধুনিক পাশ্চাত্য ব্যাকরণের কিছু স্পর্শতো আছেই। ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক ব্যাকরণের বিশ্লেষণরীতি ও পরিভাষা গ্রহণ করা হয়েছে যাকে অনুদিত পরিভাষাই বলা চলে। জ্যোতিভূষণ চাকী আরও লিখেছেন, সংস্কৃত পরিভাষা বাদ দিয়ে আমরা সমাসাদি প্রকরণকে হয়তো সহজ করে তুলতে পারি, যদি সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য বাদ দিয়ে বিভিন্ন পদের মিলিত বিন্যাস হিসেবে দেখি। সন্ধির নিয়মগুলিকে ধ্বনিতত্ত্বের সূত্রেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি এ কথাও বলেছেন, এতদিন Grammar বলতে শুধু লেখার ব্যাপারটাই বোঝাত, এখন নব্য ব্যাকরণ বলতে মুখের ভাষার ব্যাকরণই বোঝায়। এই জন্যে উচ্চারিত একটানা ধ্বনির পরস্পর সংঘাতে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন, ধ্বনিগত সংযোজন বা ধ্বনিলোপ ইত্যাদি ঘটে তা মুদ্রিত লেখার দিকে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই। এইজন্যে নব্য বাংলার ব্যাকরণে মুখের ভাষার উপরেই বেশি জোর দিতে হবে, তাতে বহুরকমের আশ্চর্য সব ধ্বনিগত রূপান্তর আমরা দেখতে পাব। তৎসম শব্দ সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার আছে। তৎসম শব্দ বাংলায় রূপে সংস্কৃতের মতো হলেও ধ্বনিতে অন্য, তাই আদৌ তা তৎসম কিনা সে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সে প্রশ্ন কিন্তু এখনও অমীমাংসিত। সংস্কৃতে যে সব শব্দের প্রচলন ছিল না আমরা সে সব শব্দ সংস্কৃতের আদলে গড়ে তুলেছি পরিভাষাদির প্রয়োজন; তাকেও কি আমরা তৎসম বলব, না 'নব্যতৎসম' বা 'অনুতৎসম' এই ধরনের কিছু নাম দেব? (তবুও তৎসম প্রীতি বিসর্জন দেওয়া যাবে না?) বাক্যের ব্যাপারে আমরা রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শুধু কর্তৃবাচ্যে আসতে পারি কিনা ভেবে দেখা দরকার। বাংলার ক্ষেত্রে কারকের ব্যাপারে বোধহয় সবচেয়ে বিতর্কিত। শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যার সম্পর্ক তা-ই কারক এই মত বর্জন করলে ব্যাপারটা হয়তো সহজ হয়ে আসবে। অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণে প্রধানত শব্দমাত্রের আলোচনা করেছি। এই পর্যায়ে বাগ্‌বিধিও আলোচনা করেছি, Semantics আজ বহুক্ষেত্র সঞ্চারী, তার যে সব অংশ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সহায়ক তা ব্যাকরণে আসুক। বাক্য বিশ্লেষণতো বাংলা ব্যাকরণে ছিলই, এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা বৃক্ষ-চিত্র বাংলা ব্যাকরণে আনতে পারি। এতে আমরা অব্যবহিত উপাদানগুলোকে আরও ভাল করে বিচার করতে পারব। বস্তুত জ্যোতিভূষণ চাকী বাংলা ভাষার খাটি ব্যাকরণ রচনার জন্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপরেখার বাইরে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন সে কাজ ইতিমধ্যেই করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চার্লস ফার্গুসন, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, পবিত্র সরকার, প্রবাল দাশগুপ্ত, উদয় নারায়ণ সিংহ, মৃণাল নাথ, রফিকুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদ, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ প্রমুখ॥